প্রথম অধ্যায়

গীতাখ্য রবীন্দ্রকাব্যের কালানুক্রমিক পরিচয় :

রবীন্দ্রনাথের সংগীতসৃষ্টি তাঁর কাব্যসৃষ্টির মতনই স্বয়ংসম্পূর্ণ ও প্রতিস্পর্ধী। 'সংগীত ও কবিতা' প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন,

> " আমরা যখন একটি কবিতা পড়ি, তখন তাহাকে আমরা শুধুমাত্র কথার সমষ্টি স্বরূপে দেখিনা - কথার সহিত ভাবের সম্মুখ বিচার করি। ভাবই মুখ্য লক্ষ্য। কথা ভাবের আশ্রয়-স্বরূপ। আমরা সংগীতকেও সেইরূপে দেখিতে চাই। সংগীত সুরের রাগরাগিনী নহে, সংগীত ভাবের রাগ-রাগিনী। আমাদের কথা এই যে কবিতা যেমন ভাবের ভাষা, সংগীতও তেমনি ভাবের ভাষা।" [১]

আমরা দেখতে পাই যে, রবীন্দ্রনাথের গানের জগৎ ও কবিতার জগৎ সম্পূর্ণ আলাদা। দুটি ধারা পাশাপাশি চলেছে এবং এই দুটি ধারাই স্বতন্ত্র প্রেরণায় গড়ে উঠেছে। তাঁর বহু প্রবন্ধ কবিতা ও আলোচনায় বারে বারে সংগীতের প্রসঙ্গ এসে পড়েছে। কারণ এই বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে সংগীতের গূঢ় সম্পর্ক আছে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তাঁর সুদীর্ঘ কাব্যজীবনের মধ্যে আমরা সর্বত্রই দেখতে পাই কিছুদিন গুরুভার প্রবন্ধ গল্প বা কবিতা লেখার পরই তিনি সংগীত রচনা করছেন তাঁর নিজের মুক্তির জন্য। কবি লিখেছিলেন,

> " সংগীতের মত এমন আশ্চর্য ইন্দ্রজালবিদ্যা জগতে আর কিছুই নেই - এ এক নূতন সৃষ্টিকর্তা !" [২]

জীবনস্মৃতি গ্রন্থে কবি তাঁর জীবনে সংগীতের প্রভাবের সম্মুখে এক মনোজ্ঞ আলোচনায় বলেছেন -

> " গানের সুরে যখন অন্তঃকরণের সমস্ত তন্ত্রী কাঁপিয়া উঠে তখন অনেক সময় আমার কাছে এই দৃশ্যমান জগৎ যেন আকার-আয়তনহীন বাণীর ভাবে আপনাকে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করে - তখন যেন বুঝিতে পারি জগৎটাকে যেভাবে জানিতেছি তাহা ছাড়া কত রকম ভাবেই যে তাহাকে জানা যাইতে পারিত তাহা আমরা কিছুই জানিনা।" [৩]

মুহূর্তেই সমস্ত সংসারের ভাবান্তর হইয়া যায়। এই সমস্ত চোখে-দেখার রাজ্য গানে-শোনার মধ্য দিয়া হঠাৎ একটা কী নূতন অর্থ লাভ করে।" ৩

বাহ্যত কবিতা ও গানের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। কবিতা মূলত বাক্‌শিল্প, অন্যদিকে সংগীত হচ্ছে সুর-শিল্প। কবিতা নির্ভরশীল শব্দের ওপর, আর সংগীত সুরের ওপর। কবিতা হচ্ছে বাক্-শিল্প বা শব্দ-নির্ভরশীল শিল্প - তার অর্থ এই নয় যে শব্দের ঝংকার বা সুরকে অস্বীকার করা হচ্ছে। শব্দের মধ্যেও সুর থাকে, কিন্তু সে সুর শব্দের অক্ষরকে আশ্রয় করে আবদ্ধ থাকে। তার স্বাধীন কোনো সত্ত্বা থাকে না। অপরপক্ষে বিশুজোড়া শব্দ ও সুরের ভিতর দিয়ে যে শব্দ ব্রহ্ম নিজেকে প্রকাশ করে ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে তাকে 'শোনা' যায় না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, -

> " এই প্রকান্ড বিপুল বিশ্ব-গানের বন্যা যখন সমস্ত আকাশ ছাপিয়ে আমাদের চিত্তের অভিমুখে ছুটে আসে তখন তাকে এক পথ দিয়ে গ্রহণ করতেই পারিনে, নানা দ্বার খুলে দিতে হয়, চোখ দিয়ে, কান দিয়ে, স্পর্শেন্দ্রিয় দিয়ে নানা দিক দিয়ে তাকে নানারকম করে নিই। এই একতান মহাসংগীতকে আমরা দেখি, শুনি, ছুঁই, শুঁকি, আস্বাদন করি।" ৪

রবীন্দ্রনাথ কবি ও সংগীতকার-এই তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়। ছন্দ ও সুরের মধ্য দিয়েই তাঁর বিশ্ববোধ। আসলে কবির জগৎ হচ্ছে সুরের জগৎ, কথার জগৎ। যার বহিঃপ্রকাশ কাব্য ও গানের মধ্য দিয়ে। কিন্তু কাব্যিক যে সুর-স্পন্দন তা স্বভাবতই সীমিত। তা কখনওই অনির্বচনীয় হয়ে ওঠে না। অন্যদিকে সংগীতের অবয়ব সৃষ্ট হয় বিশুদ্ধ সুরান্বিত সুরের উপাদানে। সংগীতের মধ্যে যাকে সুর-সঙ্গতি বলা হয়, তা আসলে সুরেরই বিভিন্ন প্রকাশ। কিন্তু এই ধ্বনি শাব্দিক নয়, অক্ষর পরিবৃত নয় এবং নয় বলেই এখানে সুরান্বিত সুরের একটি স্বাধীন সত্ত্বা থেকে যায়।

"কবির জগৎ সুরের জগৎ [illegible]) এবং কথার জগৎ - কেবল কথার জগৎ নহে। শব্দ সুর ও কথা - এই তিন সংগীতের উপাদান ও প্রাণ। জীব-জগৎ হইতে অনুক্ষণ বিচিত্র শব্দ ও সুর উত্থিত হইতেছে - আর জীবশ্রেষ্ঠ মানুষের কণ্ঠনিঃসৃত শব্দ সুর ও কথা মিলিয়া সংগীত উচ্ছ্বাসিত হইতেছে। এই অনন্ত শব্দস্রোত সুরশিল্পী কবির নিকট অত্যন্ত বাস্তব সত্য, তাই তিনি বিশ্বকে সংগীতের রূপকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।" [৫]

সংগীতের জগৎ স্বভাবতই কবিতার জগৎ থেকে আলাদা। আবার একটু গভীরে দেখলে বলা যায় কবিতার সীমানা যেখানে শেষ হয়, সেইখানে শুরু হয় গানের সূচনা, এবং তা অনেকদূর প্রসারিত হয়ে পড়ে। কবিতার জগৎ বচণীয়, কারণ সেই বচন শব্দের সীমানা-দ্বারা-বেষ্টিত। পক্ষান্তরে সংগীতকে যে অনির্বচণীয় বলা হয় তার কারণ সংগীত আসলে বচনাতীত। সংগীত সুরের এক নূতন ভুবন রচনা করে। সে সীমার মাঝে অসীমের সুর ধ্বনিত করে।

কবিতা ও গানের এই পারস্পরিক আলোচনা যাঁরা করেছেন, তাঁরা সকলেই একটি বিষয়ে একমত যে কবিতা যেখানে মানুষকে একটি নির্দিষ্ট সীমানার বাইরে নিয়ে যেতে পারে না, সংগীতের সুর-জগৎ সেখানে মানুষকে অ-লৌকিক জগতে নিয়ে যায়। কবিতা ও গানের এই আবেদন উভয়ের প্রকৃতিগত বিশ্লেষণে বিশেষ অনুধাবনযোগ্য।

বস্তুতঃ, কবিতা ও গানের এই মৌলিক পার্থক্যের কথা রবীন্দ্রনাথের অজানা ছিলনা। তত্ত্বগতদিক থেকে আলোচনা করলে দেখা যায় যে কবিতা ও গানের পারস্পরিক সম্বন্ধের তাত্ত্বিক দিক রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর একাধিক প্রবন্ধে। এখানে তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করা গেল :

ক) "সুরের সঙ্গে কথার মিলন কেউ রোধ করতে পারবে না। ওরা পরস্পরকে চায়, সেই চাওয়ার মধ্যে যে প্রবল শক্তি আছে সেই শক্তিতেই সৃষ্টির প্রবর্তনা।

শ্রেণীর বেড়ার মধ্যে পায়ের বেড়ির ঝংকার দিয়ে বেড়ানোকেই সে ওস্তাদ সাধনা বলে গণ্য করে, তার সঙ্গে তর্ক কোরো না, শ্রেণীর সে উপাসক, শাস্ত্রের সে বুলি-বাহক, পৃথিবীর নানা বিপদের মধ্যে সেও এক বিশেষ জাতীয়-কলাবিভাগে সে ফাসিস্ট।" [৬]

ভারতীতে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে কবি বলেছেন যে আমাদের ভাবপ্রকাশের দুটি উপকরণ কথা ও সুর। উভয়ে একই প্রকারে ভাব প্রকাশ করে।

ক) "ভাবপ্রকাশের অঙ্গের মধ্যে কথা ও সুর উভয়কেই পাশাপাশি ধরা যাইতে পারে। সুরের ভাষা ও কথার ভাষা উভয় ভাষায় মিশিয়া আমাদের ভাবের ভাষা নির্মাণ করে। কবিতায় আমরা কথার ভাষাকে প্রাধান্য দিই ও সংগীতে সুরের ভাষাকে প্রাধান্য দিই। ... সংগীত অবিকল কবিতার ন্যায়। সংগীতেও ছন্দ আছে। তালে তালে তাহা সুরের লীলা নিয়মিত করিতেছে।" [৭]

তিনি আরও বলেছিলেন যে, সংগীতের তুলনায় ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে কবিতা অনেক বেশি উন্নতি লাভ করেছে। কারণ সংগীতের সুরের জন্য তার একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। ফলে যে মনোযোগ কবিতাকে আকর্ষণীয় করার জন্য দেওয়া হয়েছে - সংগীতে ভাবের প্রতি তেমন মনোযোগ দেওয়া হয়নি। শুধুমাত্র কথার মিষ্টতা নেই বলেই কবিতায় ভাবের চর্চা করতে হয়েছে।

গ) "কবিতায় আছে অগীত-সংগীত, তার সীমানায় যদি গীত সংগীতের ব্যবধান অলংঘ্য হয় তা হলে তো স্বভাবতই গানের সৃষ্টি হতে পারে না। কোনো নারীর পায়ে চলার ভঙ্গী সুন্দর হতে পারে, কিন্তু যদি তার মন লাগে তা হলে সে কি তার সেই ভঙ্গীকে নৃত্যকলায় জাগিয়ে তুলতে পারে না? পায়ে চলার শিল্প যেমন নাচ, বাক্যের শিল্প রূপ তেমনি গান। অবশ্য আরও এক জগতের শিল্প আছে, তাকে বলে কাব্য।

য়ুরোপের দেশবিশ্রুত সংগীতশিল্পী Gluck - এর বচন উদ্ধৃত করে দিই -

My idea was that the relation of music to poetry was much the same as the same as that of harmonious colouring and well disposed light and shade to an accurate drawing, which animates the figures without altering the outlines." [৮]

পরবর্তী জীবনে রবীন্দ্রনাথ গীতিকলা সম্মুখে মুক্ত কণ্ঠে বলেছেন যে গানের কথা কখনও যেন গানকে না অতিক্রম করে, কারণ কথা তো গানের বাহন মাত্র।

ঘ) " গান নিজের ঐশ্বর্যেই বড়ো, বাক্যের দাসত্ব সে কেন করিতে যাইবে ? বাক্য যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানেই গানের আরম্ভ। যেখানে অনির্বচনীয় সেইখানেই গানের প্রভাব। বাক্য যাহা বলিতে পারেনা গান তাহাই বলে।" [৯]

ধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত একটি পত্রে কবি সংগীতের সঙ্গে কবিতার তুলনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন -

ঙ) "সংগীতের সঙ্গে কাব্যের একটা জায়গায় মিল নেই। সংগীতের সমস্তটাই অনির্বচণীয়। কাব্যে বচনীয়তা আছে সে কথা বলা বাহুল্য - অনির্বচনীয়তা সেইটেকেই বেষ্টন করে হিল্লোলিত হতে থাকে, পৃথিবীর চার দিকে বায়ুমণ্ডলের মতো। এ পর্যন্ত বচনের সঙ্গে অনির্বচনের, বিষয়ের সঙ্গে রসের গাঁঠ বেঁধে দিয়েছে - ছন্দ। পরস্পরকে বলিয়ে দিয়েছে - 'যদেতদ্ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।' বাক এবং অবাক বাঁধা পড়েছে ছন্দের মাল্যবন্ধনে।" [১০]

কার্যত দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটা দ্বৈত সত্তা সবসময় সক্রিয় থেকে গেছে। তাঁর কবিসত্তা যেমন 'বনফুল'থেকে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত একটানা সক্রিয় ছিল, একইভাবে সক্রিয় ছিল তাঁর সাংগীতিক সত্তাও। এই দুইয়ের মধ্যে কোন সময়েই কোনো বিরোধ ঘটেনি। কিন্তু যা লক্ষ্য করার বিষয় তা হচ্ছে যে আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হিসাবে এই দুটি সত্তার প্রকাশগত তারতম্য ঘটেছে। কখনও কবিতা হয়ে উঠেছে মুখ্য প্রকাশ, কখনও বা গান। আবার এমন হয়েছে যে একইসঙ্গে কবিতা ও গান পাশাপাশি স্থান পেয়েছে। আবার কোথাও গান হয়ে উঠেছে যথার্থ কবিতা। সম্ভবত এই কারণে আমরা দেখতে পাই যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থে সংকলিত কবিতার সঙ্গে গানকেও রবীন্দ্রনাথ স্থান দিয়েছিলেন। তার কারণ হয়ত এই যে কাব্যগ্রন্থে বিধৃত কবিতাগুলির সঙ্গে গানগুলি ছিল অভিন্ন। অথবা এমনও হতে পারে যে যেকথা কবিতার ভিতর দিয়ে বলা যায়নি সেকথা বলা গিয়েছিল গানের মধ্য দিয়ে। তিনি বললেন -

> "ছন্দে শব্দে বাক্যবিন্যাসে সাহিত্যকে সংগীতের আশ্রয় তো গ্রহণ করিতেই হয়। যাহা কোনো মতে বলিবার যো নাই, এই সংগীত দিয়াই তাহা বলা চলে। অর্থ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে যে কথাটা যৎ-সামান্য এই সংগীতের দ্বারাই তাহা অসামান্য হইয়া উঠে। কথার মধ্যে বেদনা এই সংগীতই সঞ্চার করিয়া দেয়।"[১১]

তাই তাঁর কাব্যগ্রন্থে আমরা দেখতে পাই গানগুলি হয়ে উঠেছে কবিতার সম্পূরক। এইভাবে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে গানগুলি একটা বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে বিধৃত হয়েছে। তারপর একটা সময় এল যখন গান কবিতার জগৎ অধিকার করল। বিশেষভাবে এটা দেখা যায় গীতাঞ্জলিপর্বে। এই সময়ে তাঁর নিরীক্ষা চলে দেশী-বিদেশী গান ভেঙে তাতে নতুন সুরারোপ করে। গানকে তিনি কবিতা থেকে ভেঙে এনে নতুন রূপ দেন আবার গান ভেঙে লেখেন কবিতা। তারপর আস্তে আস্তে গান ও কবিতার জগৎ পরস্পরের থেকে দূরে সরে যেতে থাকল, এবং সম্পূর্ণরূপে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে আর একবার অন্যোন্য হয়ে উঠল 'সানাই' কাব্যগ্রন্থে। কোথাও বা আগে গান তার থেকে পরে কবিতা, কোথাও বা আগে কবিতা তার থেকে পরে গান। কোথাও বা দুটি ক্ষেত্রে রূপের

কোনো পরিবর্তন হয়নি, কোথাও বা গান থেকে রূপান্তরিত হওয়ার ফলে কিছু পরিবর্তন এসেছে। এরপর একেবারে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের সৃষ্টিতে গান ও কবিতাকে যে রূপে ও যে অবস্থায় দেখা গিয়েছিল অন্তিম লগ্নে তাদের দেখা গেল অন্যরূপে। প্রথমযুগে কবিতা ও গানে যে সখ্যতা ছিল, যার প্রকাশ দেখেছি বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে, দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রসৃষ্টির অন্তিমপর্বে তার অস্তিত্ব প্রায় নেই। কবিতা ও গান স্বাধীনভাবে নিজের দুটি স্বতন্ত্র ভুবনে লীন হয়ে গেল। তাই তাঁর কবিতা ও সংগীত সম্বন্ধে এক কবিসমালোচকের মন্তব্যে দেখি যে তিনি বলেছেন -

> "রবীন্দ্রনাথের গান যে কেবল অপূর্ণ সুরলহরী তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে অপরূপ বাণী ব্যঞ্জনাও বটে। অভেদাঙ্গ হরগৌরীর মত, দেহ ও আত্মার মত, একই দুই হয়েছে আর দুটিতে মিলে পুনরায় এক হয়ে উঠেছে সচকিত রসিক চিত্তের চোখের সামনে। রবীন্দ্রসংগীতে সুরের আকর্ষণেও স্তব্ধ হতে হয়, আর তার ভাষার ব্যঞ্জনায় কথার কারুকার্যেও অভিভূত হওয়া অনিবার্য। কবিতা ও রাগ উভয়ের অর্ধনারীশ্বর সত্ত্বা ও শ্রী যার চিত্তপটে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, সে যে মহাভাগ্যবান সন্দেহ নেই, কেবল এক দেশে পুলক-অপলক দৃষ্টি পড়ে যার সেও ধন্য হয়।" [১২]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতা ও গানের মধ্যে কোনো ভেদরেখা টানতেন না। তাঁর হৃদয়ভার উন্মোচনে কবিতা ও গান যুগ্মবাহন। ফলতঃ, যাকে আমরা গীতাখ্য কাব্য বলে চিহ্নিত করেছি কীভাবে তার সূচনা, অগ্রগতি ও পরিণতি ঘটেছে তার কথা মনে রেখে নিম্নলিখিত তালিকাটি তুলে ধরা গেল -

ক্রমিক সংখ্যা	কাব্যগ্রন্থের নাম	কবিতার সংখ্যা	গানের সংখ্যা
১.	কবি-কাহিনী (১৮৭৮)	X	X
২.	বনফুল (১৮৮০)	X	X
৩.	ভগ্নহৃদয় (১৮৮১)	X	X

ক্রমিক সংখ্যা	কাব্যগ্রন্থের নাম	কবিতার সংখ্যা	গানের সংখ্যা
৪.	সন্ধ্যাসংগীত (১৮৮২)	২১	X
৫.	প্রভাতসংগীত (১৮৮২)	১৩	X
৬.	প্রকৃতির প্রতিশোধ (১৮৮৪)		
৭.	ছবি ও গান (১৮৮৪)	২৭	২
৮.	শৈশব সংগীত (১৮৮৪)	**	৫
৯.	ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (১৮৮৪)	২০	১
১০.	কড়ি ও কোমল (১৮৮৬)	৮৩	১৩
১১.	মানসী (১৮৯০)	৬৪	৪
১২.	সোনার তরী (১৮৯৪)	৪২	৫
১৩.	চিত্রা (১৮৯৬)	৩৫	২
১৪.	চৈতালী (১৮৯৬)	৭১	২
১৫.	কণিকা (১৮৯৯)	১১০	X
১৬.	কথা (১৯০০)	২৫	X
১৭.	কাহিনী (১৯০০)	৮	X
১৮.	কল্পনা (১৯০০)	৪১	১৭
১৯.	ক্ষণিকা (১৯০০)	৬২	৫
২০.	নৈবেদ্য (১৯০১)	১০০	২২
২১.	স্মরণ (১৯০২)	২৭	X
২২.	শিশু (১৯০৩)	৫০	২
২৩.	উৎসর্গ (১৯০৩)	৫৯	৩

** শৈশব সংগীত গ্রন্থের ভূমিকায় কবি লিখেছিলেন, "তেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের কবিতাগুলি প্রকাশ করিলাম।"

ক্রমিক সংখ্যা	কাব্যগ্রন্থের নাম	কবিতার সংখ্যা	গানের সংখ্যা
২৪.	খেয়া (১৯০৬)	৫৫	১০
২৫.	গীতাঞ্জলি (১৯১০)	১৫৭	৮৫
২৬.	গীতিমাল্য (১৯১৪)	১১১	৮৯
২৭.	গীতালি (১৯১৪)	১০৮ + ১১*	৬৮ + ৫**
২৮.	বলাকা (১৯১৬)	৪৫	৪
২৯.	শিশু ভোলানাথ (১৯২২)	২৭	X
৩০.	পলাতকা (১৯১৮)	১৫	X
৩১.	পূরবী (১৯২৫)	৭৭	৩
৩২.	লেখন (১৯২৭)	-	-
৩৩.	মহুয়া (১৯২৯)	৬৭	১১
৩৪.	বনবাণী (১৯৩১)	১৭	২
৩৫.	পরিশেষে (১৯৩২)	১১	৩
৩৬.	পুনশ্চ (১৯৩২)	৫০	X
৩৭.	বিচিত্রিতা (১৯৩৩)	৩১	১
৩৮.	শেষ সপ্তক (১৯৩৫)	৫৬	X
৩৯.	বীথিকা (১৯৩৫)	৮৭	৫
৪০.	পত্রপুট (১৯৩৬)	১৮	X

* লেখক কর্তৃক বর্জন চিহ্নাংকিত অসম্পূর্ণ ১০টি কবিতা।

** এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য ও গীতালির গানগুলির সমকালীন কয়েকখানি গানও কবিতা রবীন্দ্ররচনাবলীর একাদশ খণ্ডে সংযোজনাংশে মুদ্রিত হয়েছে। সে গানগুলি - (১) জাগো নির্মল নেত্র (১৩১৭ - আশ্বিন) (২) প্রভু আমার প্রিয় আমার (৫ আশ্বিন ১৩১৭) (৩) আছি নির্ভয় নিদ্রিত ভুবনে (অগ্রহায়ণ ১৩১৭) (৪) যদি আমায় তুমি বাঁচাও তবে (১৩১৭) (৫) দুঃখ যে নয়রে চিরন্তন (১৩ আশ্বিন, ১৩২১)

ক্রমিক সংখ্যা	কাব্যগ্রন্থের নাম ও রচনাকাল	কবিতার সংখ্যা	গানের সংখ্যা
৪১.	শ্যামলী (১৯৩৬)	২২	X
৪২.	খাপছাড়া (১৯৩৭)	১০৩	X
৪৩.	ছড়ার ছবি (১৯৩৭)	৩২	X
৪৪.	প্রান্তিক (১৯৩৮)	১৮	X
৪৫.	সেঁজুতি (১৯৩৮)	২২	X
৪৬.	প্রহাসিনী (১৯৩৯)	৩২	১
৪৭.	আকাশ প্রদীপ (১৯৩৯)	২২	X
৪৮.	নবজাতক (১৯৪০)	৩৫	১
৪৯.	সানাই (১৯৪০)	৬১	২৩
৫০.	রোগশয্যায় (১৯৪০)	৩৯	১
৫১.	আরোগ্য (১৯৪১)	৩৩	X
৫২.	জন্মদিনে (১৯৪১)	২৯	X
৫৩.	ছড়া (১৯৪১)	১১	X
৫৪.	শেষ লেখা (১৯৪১)	১৫	৩

উপরে উল্লিখিত তালিকা পর্যালোচনা করলে রবীন্দ্রনাথ রচিত কাব্যগ্রন্থগুলির প্রত্যেকটির রচনাকাল, কবিতা ও গানের সংখ্যার একটি পরিষ্কার ছবি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সুবিপুল রবীন্দ্রসাহিত্যে সংগীত একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। তাঁর এই সমগ্র সংগীত জগতে আমরা পেয়েছি তাঁর (১) নাটকের গান, (২) অন্যান্য গীতগ্রন্থের গান এবং (৩) কাব্যভুক্ত গান। এই কাব্যভুক্ত গান অর্থাৎ কাব্যগ্রন্থের মধ্যে সুরায়িত গান ও কবিতাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

রবীন্দ্রনাথ প্রধানত কবি - কাব্যের মধ্যেই তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, আর গানের মধ্যেই তার পরিণতি। তাই তিনি বলেছিলেন যে সংগীতের মধ্য দিয়েই আমাদের মনোভাব শ্রেষ্ঠতম ভাবে প্রকাশিত হয়। কবিতার মধ্যেও লুকিয়ে আছে সংগীত- তাই আমরা দেখি কোথাও কোথাও কবিতা পাঠ করা হয় সুর সহযোগে। রবীন্দ্রনাথ বললেন,

" সংগীত আর কিছু নয় - সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে কবিতা পাঠ করা।" ১৩

তালিকা অনুযায়ী আমরা দেখি যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের সূচনা শৈশবে অর্থাৎ তের বৎসর বয়সে। এই সময়ের রচিত কিছু কিছু কবিতা বাদ দিলে আমরা তাঁর সম্পূর্ণ কাব্যগ্রন্থ হিসাবে প্রথম রচনা দেখি -'কবিকাহিনী' - ১৮৭৮ সালে। এই সময়ে 'ভারতী'(১৮৭৮ সালে) পত্রিকাতে যেমন রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, প্রভৃতি প্রকাশিত হয়, তেমনি একটি নাতিদীর্ঘ কাব্যও প্রকাশিত হয় - 'কবিকাহিনী'। এই 'কবিকাহিনী' কাব্যে কবির প্রকৃতি প্রেম নানা ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। অমিত্রাক্ষর ছন্দ সমন্বিত এই কাব্য গ্রন্থের কবিতায় কোন সুরযোজিত গানের উপস্থিতি নেই।

এরপর 'বনফুল' (১৮৮০) রচিত হয়। বনফুল সে যুগের ইংরাজী আদর্শে রচিত, আটটি সর্গে বিভক্ত আখ্যায়িকা কাব্য। এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির মধ্যে মাত্র একটিই গান - এটি নীরদ কর্তৃক বাগানে গীত।

" কি জানি লো বালা ! কিসের তরে
হৃদয় আজিকে কাঁদিয়া উঠে।
কি জানি কি ভাব ভিতরে ভিতরে
জাগিয়া উঠেছে হৃদয় পুটে।"

১৮৮১ - রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ভগ্নহৃদয়'-এর প্রকাশ। এটি একটি গীতিকাব্য। কবি এটিকে ফুলের মালার সঙ্গে তুলনা করেছেন। ভগ্নহৃদয় কাব্যগ্রন্থের আয়তন অনেক বড়।

এতে চৌত্রিশটি সর্গ আছে। প্রমথনাথ বিশী এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

> "এই শিথিলবন্ধ কাব্যে ঘটনার ত্রুটি ভাবনা দিয়া হারাইয়া লইবার চেষ্টা কবিকাহিনী ও বনফুলের চেয়ে অনেক বেশী। ইহাতে অনেকগুলি সর্গ আছে যাহাতে কোন ঘটনা নেই, কেবল পাত্র-পাত্রীর গানের দ্বারাই সে সর্গগুলি গঠিত। গানগুলি যখন তখন আসিয়া পড়িয়া ঘটনার ক্ষীণ শোভাযাত্রা ধীর মন্থর করিয়া দিয়াছে।" [১৪]

এ কাব্যগ্রন্থের সর্বমোট আটটি গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছে, আর কিছু গান আছে যেগুলির স্বরলিপির সন্ধান পাওয়া যায়নি। গানগুলি নিম্নলিখিতরূপ -

১) ক্ষমা কর মোরে সখি
২) নাচ শ্যামা তালে তালে
৩) আঁধার শাখা উজল করি
৪) নীরব রজনী দেখ মগ্ন জোছনায়
৫) সখি, ভাবনা কাহারে বলে
৬) কিছুই তো হল না
৭) বুঝেছি বুঝেছি সখা
৮) তুই রে বসন্ত সমীরণ।

ভগ্নহৃদয় কাব্যগ্রন্থ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে এর একটি গান - 'উপহার' শীর্ষক " তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।" - ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় কার্তিক (১২৮৭) ভারতীতে প্রকাশকালে এটি দশ পংক্তির গান হিসাবে মুদ্রিত হয়।

রাগিণী - ছায়ানট

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হবো নাকো পথহারা।

যেথা আমি যাই নাকো, তুমি প্রকাশিত থাকো
আকুল এ আঁখি 'পরে ঢাল গো আলোকধারা।
ও মুখানি সদা মনে জাগিতেছে সংগোপনে
আঁধার হৃদয়মাঝে দেবীর প্রতিমা-পারা।
কখনো বিপদে যদি ভ্রমিতে চায় এ হৃদি
অমনি ও মুখ হেরি সরমে যে হয় সারা।
চরণে দিনু গো আনি - এ ভগ্নহৃদয়খানি
চরণ রঞ্জিব তব এ হৃদি-শোণিত ধারা।

ভগ্নহৃদয় যে কালে (১৮৮১) প্রকাশিত হয়েছিল, সে সময়ে দীর্ঘকাব্য, কাহিনী-কাব্য, বা 'মেঘনাদবধ' কাব্যের মত এপিক কাব্য রচনাই বাংলা সাহিত্যের প্রথা ছিল।

"তিনিও (রবীন্দ্রনাথ) দীর্ঘ কাহিনী-কাব্য দিয়াই কবিজীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু অত্যল্পকালের অভিজ্ঞতাতেই তাঁহার কবি প্রকৃতি বুঝিতে পারিয়াছিল ওগুলি তাঁহার পথ নয় - তাঁহার প্রকৃত পথ গীতিকবিতা-লিরিক। যখন হইতে তিনি এই লিরিকে আসিয়া চূড়ান্তভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন তখন হইতেই তাঁহার কাব্য তিনি প্রকাশযোগ্য, মনে করেন। সে কাব্য 'সন্ধ্যাসংগীত'।" [১৫]

কবিকাহিনী, বনফুল, ভগ্নহৃদয় - এ কাব্যগুলির মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্তমান। সবগুলি যেন এক ছাঁচে ঢালা, উচ্ছ্বাসে ভারাক্রান্ত। তাই কবি এদের তাঁর কাব্যের দরবারে প্রবেশ নিষেধ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের মতে তাঁর প্রকৃত কাব্যজীবনের শুরু তাঁর 'সন্ধ্যাসংগীত' পর্ব থেকে।

'সন্ধ্যাসংগীত'রচিত হয় ১৮৮১ সালে। এর কবিতাগুলি প্রথম প্রকাশিত হয় ভারতীতে। সন্ধ্যাসংগীতের কাব্যগুলির মধ্যে মান-অভিমান-বিষাদ, রাগ-অনুরাগ প্রভৃতি

বিচিত্র ভাবের প্রকাশ ঘটেছে। এই গীতিকবিতায় কবিতার সংখ্যা এক্‌শটি। যদিও এখানে সুরান্বিত কোন গান নেই - তথাপি এই কাব্যে গানের অনুষঙ্গ ফিরে ফিরে এসেছে। 'অনুগ্রহ' কবিতার মধ্যে কবির মনের আকাংখা ব্যক্ত হয়েছে -

'কবি হয়ে জন্মেছি ধরায়' -
'ভালবাসি আপনা ভুলিয়া,
গান গাহি হৃদয় খুলিয়া।'-[১৬]

'গান সমাপন' - কবিতাটিতে লিখছেন -

'এমন মহান এ সংসারে জ্ঞানরত্নরাশির মাঝারে
আমি দীন শুধু গান গাই, তোমাদের মুখপানে চাই।
ভালো যদি না লাগে সে গান ভালো সখা,
তাও গাহিব না।'

পরবর্তী কাব্য 'প্রভাতসংগীত' প্রকাশিত হয় ১৮৮৩ যে মাসে। এ কাব্যগ্রন্থটিতে তেরটি কবিতা আছে। প্রভাতসংগীত নাম হলেও এখানে কবির সুরারোপিত কোন গানই এখানে নেই। এখানে সবই অগেয় সংগীত। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতার মধ্য দিয়েই প্রভাত সংগীতের নিঃসংশয় আত্মপ্রকাশ। এ আর কিছুই নয় নিজের থেকে নিষ্ক্রমণ করে বৃহৎ জগতের অভিমুখে বাহির হওয়া। তাই এ কাব্যগ্রন্থের 'স্রোত' কবিতায় বাহির পথে চলার জন্য এত উদ্‌বেগ -

জগত-স্রোতে ভেসে চলো, যে যেথা আছ, ভাই।
চলেছে যেথা রবিশশী চল রে সেথা যাই।[১৭]

নিজের অন্তরের সুখ দুঃখ থেকে মুখ তুলে বহির্জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করে পৃথিবীর ছবি তাঁর মুখ নেত্রে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল - তখন তাঁর সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন

রূপ ও সুরের উৎস দেখা দিল তাঁর ছবি ও গানের মধ্যে।

'ছবি ও গান'-এর প্রকাশকাল ১৮৮৪। এখানে কবিতার সংখ্যা সাতাশটি, কিন্তু তার মধ্যে দুটিতে কবি সুরারোপ করেছিলেন। ছবি ও গান কবির বয়ঃসন্ধিকালের রচনা। ছবি ও গান - এই দুটি শব্দের মধ্য দিয়ে সাহিত্যের দুটি দিকরূপ ও রসের প্রকাশ ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ গীতিকবি - গানই তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তাই তাঁর সকল রচনাই বারে বারে সংগীতের সঙ্গে এসে বিশ্রাম লাভ করেছে।

এরপর 'শৈশব সংগীত' প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ তে। এই গ্রন্থে কবির তেরো থেকে আঠার বৎসর বয়সের রচনাগুলি গাথার আকারে রয়েছে -

১) ফুলবালা - (গাথা)

২) অতীত ও ভবিষ্যৎ - (কবিতা)

৩) দিকবালা - (কবিতা)

৪) প্রতিশোধ - (গাথা)

৫) ছিন্ন লতিকা - (কবিতা)

৬) ভারতী বন্দনা - (কবিতা)

৭) লীলা - (গাথা)

৮) ফুলের ধ্যান - (কবিতা)

৯) অপ্সরা প্রেম - (গাথা)

১০) প্রভাতী - (গান)

১১) কামিনীফুল - (কবিতা)

১২) লাজময়ী - (কবিতা)

১৩) হরহৃদে কলিকা - (কবিতা)

১৪. ভগ্নতরী - (গাথা)

১৫. পথিক - (দীর্ঘ কবিতা)

এই কাব্যগ্রন্থে কবির সুরারোপিত পাঁচটি গান আছে যেগুলি গীতবিতানে পাওয়া যায়।

আমরা জানি যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর তেরো থেকে আঠার বৎসর বয়সের রচিত প্রায় সকল রচনাই তাঁর কাব্যগ্রন্থাবলী থেকে বাদ দিয়েছিলেন, কেবল রেখেছিলেন 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী।'

'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ সালে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন-

"এই কথা বলে রাখি ভানুসিংহের পদাবলী ছোটো বয়স থেকে অপেক্ষাকৃত বড়ো বয়স পর্যন্ত দীর্ঘকালের সূত্রে গাঁথা। তাদের মধ্যে সবাই সমান দরের নয়।" এখানে পদাবলীর সংখ্যা কুড়িটি, কিন্তু সুরলিপি পাওয়া যায় মাত্র ন্যুটির। গোবিন্দদাস বিরচিত "সুন্দরী রাধে আওয়ে বনি পদটিতে কবি নিজে সুর যোজনা করেন।

এর পরবর্তী রচনা 'কড়ি ও কোমল'- রচনাকাল ১৮৮৬। কবি জীবনস্মৃতিতে বলেছেন - "কড়ি ও কোমল মানুষের জীবন নিকেতনের সেই সম্মুখের রাস্তাটায় দাঁড়াইয়া গান। সেই রহস্যসভার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আসন পাইবার জন্য দরবার -

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই। -
বিশ্বজীবনের কাছে ক্ষুদ্র জীবনের এই আত্মনিবেদন।"[১৮]

কয়েক বৎসরের রচিত কবিতা এই কাব্য গ্রন্থে সংগৃহীত হওয়ায় এখানে বিচিত্র সুরঝংকার শ্রুত হয়। এই কাব্যগ্রন্থের শেষাংশের গান ও কবিতা প্রথমাংশের কবিতাগুচ্ছ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। অনেকগুলি কবিতায় তাঁর জীবনের প্রথম শোকের ছায়া সুস্পষ্ট। কড়ি ও কোমলের মূল কবিতাগুলি সনেট জাতীয় কবিতা। এখানে কবিতার সংখ্যা তিরাশিটি ও তার মধ্যে কবি সুরায়িত করেছিলেন তেরটি গানকে, কিন্তু শুধুই কি কবিতাকে সুরায়িত

করা, এই কাব্যগ্রন্থের নামকরণের মধ্যেও রয়েছে সংগীতশাস্ত্রের শব্দ। পূর্ববর্তী কাব্য-গ্রন্থ অপেক্ষা এখানে গানের সংখ্যা অধিক।

'ছবি ও গান' এবং 'কড়ি ও কোমলের' মধ্যে আমরা চিত্ররীতির পরিচয় পাই। সাংগীতিক আকুলতা এখানে কম। 'মানসী' এই পর্যায়ের শেষ কাব্য।'

"ইহাতেও সেই পুরাতণ দ্বন্দ্ব, চিত্র ও সাংগীতিক পন্থায়। ... কিন্তু মানসীর অধিকাংশ কবিতাই সুনিপুণভাবে সাংগীতিক পন্থাকে অনুসরণ করিয়া আভাস দিতেছে যে, ভবিষ্যতে ইহাই কবির প্রধান বাহন হইয়া উঠিবে।" [১১]

মানসী-র রচনাকাল ১৮৯০। কবিতার সংখ্যা চৌষট্টিটি, আর সুরায়িত গানের সংখ্যা চারটি। মানসীর অনেক কবিতাতেই নিদারুণ মৃত্যুশোকের পরিচয় আছে। আবার থেকে থেকে প্রেমের মধ্যে কী একটা গভীর 'নিস্ফল কামনা' কবিকে যেন পীড়িত করছে। গাজীপুরে বাসকালে কবি আটাশটি কবিতা লেখেন ১২৯৫ বৈশাখ হইতে আষাঢ়ের মধ্যে। এইগুলির মধ্যে তাঁর মানসলোকের যথার্থ সন্ধান পাওয়া যায়।

এরপর -'সোনার তরী'র আবির্ভাব রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের প্রবাহপথে একটা পরিবর্তনের সূচনা করল। বৃহত্তর মানবজীবনে প্রবেশ করল রবীন্দ্রনাথের কাব্য। সোনার-তরী রচনার সময় রবীন্দ্রনাথের মনে দার্শনিক অথবা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয় না। সোনার তরীর রচনাকাল ১৮৯৪। এখানে বিয়াল্লিসটি কবিতা আছে - তার মধ্যে সুরায়িত হয়েছে পাঁচটি।

১৮৯৬ সালে পঁয়ত্রিশটি কবিতা নিয়ে 'চিত্রা'- কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ। এখানে কবি বিশুদ্ধ সৌন্দর্যকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছেন। আবার ব্যক্তিগত জীবনের আশা-আকাংক্ষা, সুখ-দুঃখের কথাও বলেছেন। চিত্রা কাব্যে গানের সংখ্যা তিনটি।

সোনার তরী, চিত্রা ও চৈতালি কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে বৃহত্তর লোকসমাজে প্রবেশের কাব্য। প্রিয়জনের প্রেমময় স্মৃতি সোনার তরীর প্রেরণা। নিখিল বিশ্বের সৌন্দর্য্য 'চিত্রা' কাব্যের প্রেরণা - 'উর্বশী' কবিতায় যার পরিপূর্ণ প্রকাশ, আর সংসারের অকিঞ্চিৎকর ঘটনা, প্রাথমিক জীবনরস ও আনন্দ হচ্ছে চৈতালি কাব্যের মূলকথা।

কবি বৈচিত্র্যের সাধক। এই অপরূপা ধরিত্রীর বৈচিত্র্যের তিনি পূজারী। বিশুদ্ধ সৌন্দর্যকে একটি রূপদানের উদ্দেশ্যে কবি উর্বশীর সৃষ্টি করলেন -

নহ মাতা নহ কন্যা, নহ সুন্দরী রূপসী
হে নন্দনবাসিনী উর্বশী। [২০]

'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থে কবি তিনটি কবিতাকে সুরান্বিত করেছেন।

'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পরই শুরু 'চৈতালি' কাব্যগ্রন্থের - ১৮৯৬। 'চিত্রা' কাব্যের লিরিকের রেশ মিলিয়ে যায়নি, তার রেশ এসে মিশেছে 'চৈতালি' পর্বে। 'চৈতালির' সুর পৃথিবীকে স্বীকার করে নেওয়ার সুর। 'চৈতালি' কাব্যে উনআশিটি কবিতা আছে, কিন্তু গানের সংখ্যা মাত্র দুটি। কবি বলেছিলেন যে, 'চৈতালির অনেক কবিতায় গানের বেদনা আছে, কিন্তু গানের রূপ নেই। এর দ্বিতীয় কবিতাটি তার একটি উদাহরণ -

চলে গেছে মোর বীণাপাণি
কতদিন হল সে না জানি।
কী জানি কী অনাদরে বিস্মৃত ধূলির পরে
ফেলে রেখে গেছে বীণাখানি। [২০]

'চৈতালির পর 'কণিকা', 'কথা ও কাহিনী' - এ পর্বে কোন গান পাওয়া যায় না।

১৯০০ তে 'কল্পনা'-র আর্বিভাব হল হাতে গানের ডালি নিয়ে - প্রায় তিন বৎসর পরে। এখানে উনপঞ্চাশটি কবিতা আছে - এর মধ্যে বেশ কিছু কবিতায় তিনি

সুরারোপ করেছিলেন। 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থে তেইশটি গান আছে। কল্পনার কবিতাগুলি কল্পনার ঐশ্বর্যে অতুলনীয়। কবি যখন উত্তরবঙ্গের নদীপথে ঘুরছেন - আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে ঝড় ও বর্ষণও আছে - সেই সময়ে এ কাব্যগ্রন্থের অনেকগুলি গান রচনা করেছিলেন - লজ্জিতা, হতভাগ্যের গান, যাচ্না, কাল্পনিক, মানসপ্রতিমা, সংকোচ, প্রার্থী, সকরুণা, প্রণয়প্রশ্ন, ভিখারী প্রভৃতি। এগুলিতে সুর যোজিত হলেও 'হতভাগ্যের গান' - একটি বড় কবিতা।

কল্পনার শেষকবিতা রচিত হওয়ার পরই সম্ভবত "ক্ষণিকা'র সূত্রপাত। এতদিনে কবি জীবনের অতীত স্মৃতি ও অলীক কল্পনাকে অতিক্রম করে জীবনের সহজ সরল লঘু দিকের প্রতি তাঁর দৃষ্টি ফিরিয়েছেন। তাই 'ক্ষণিকায়' এসে তিনি বললেন -

শুধু অকারণ পুলকে
ক্ষণিকের গান গারে আজি প্রাণ
ক্ষণিক দিনের আলোকে।" [২২]

'ক্ষণিকায়' কবিতার সংখ্যা বাষট্টিটি - আর গানের সংখ্যা ছয়। 'ক্ষণিকায়' রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের এক অখণ্ডরূপ ফুটে উঠেছে। এর সুর, ছন্দ ও রীতির বৈশিষ্ট্যও বাংলায় নতুন। এখানে বিভিন্ন স্বাদের কবিতা আছে। কবি যদিও ছয়টি কবিতাকে গানে রূপান্তরিত করেছিলেন - তথাপি তাঁর 'শেষ' কবিতায় তিনি বলেছিলেন -

সবই হেথায় একটা কোথাও
করতে হয় রে শেষ,
গান থামিলে তাই তো কানে
থাকে গানের রেশ। [২৩]

'নৈবেদ্য' কাব্য কবির আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার কাব্য। পূর্বতন ব্রহ্মসংগীত থেকে 'গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালির' অভিজ্ঞতায় পৌঁছবার মাঝখানে হচ্ছে 'নৈবেদ্যের' অভিজ্ঞতা। এখানে নানাশ্রেণীর কবিতা আছে। সর্বমোট একশটি কবিতার মধ্যে কবি সুরারোপ করেছিলেন

সতেরটিতে। প্রথম কবিতাটিতেই তিনি জীবনস্বামীর উদ্দেশ্যে অর্ঘ দিয়েছিলেন ভক্তি-নম্র-গীতির মধ্য দিয়ে -

প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী
দাঁড়াব তোমার সম্মুখে।
করি জোড়কর হে ভুবনেশ্বর,
দাঁড়াব তোমার সম্মুখে।[২৪]

'নৈবেদ্য' প্রকাশিত হয় ১৯০১ সালের জুন মাসে। পরবর্তী গীতাখ্য কাব্যত্রয়ের আধ্যাত্মিক গভীরতা ও মননের মধ্যে প্রবেশের সোপান হিসাবেই 'নৈবেদ্যের' গুরুত্ব। তাই এ কাব্যের গানগুলির মধ্যে আমরা কবির অনুভব, ভগবদবিশ্বাস ও মণীষার পরিচয় পাই। তাই শেষ কবিতায় গেয়ে উঠলেন -

আর যত সুখ পাই বা না পাই, তবু
এক সুখ শুধু মোর তরে তুমি রাখিও।
সে সুখ কেবল তোমার আমার প্রভু,
সে সুখের পরে তুমি জাগ্রত থাকিয়ো।[২৫]

স্ত্রীর মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ যে আঘাত পেয়েছিলেন তার একমাত্র প্রকাশ ঘটেছিল ১৯০৩ সালে প্রকাশিত 'স্মরণ' কাব্যগ্রন্থের মধ্য দিয়ে। এটি সাতাশটি কবিতাগুচ্ছ নিয়ে সৃষ্ট - এখানে কোন গান নেই। কবির বেদনাই যেন এখানে সকরুণ রাগে বেজে উঠেছে।

শিশুদের প্রতি কবির প্রীতি ও ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ 'শিশু' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯০৩ সালে। এ কাব্যগ্রন্থের পঁচাশটি কবিতার মধ্যে কবি দুটিতে সুরারোপ করেছিলেন।

১৯০৪ সালে 'উৎসর্গ' কাব্যগ্রন্থ কিছু পূর্বের ও কিছু সমসাময়িক কবিতা একত্র করে প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে তিনটি গান আছে।

১৯০৬ সালে প্রকাশিত হল রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া' কাব্য। খেয়ার কাব্যের মধ্যে আমরা রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক কবিতা ও গানের এক নবতম প্রকাশভঙ্গি দেখতে পাই। গীতাখ্য কাব্যত্রয়ে এসে কবিতা নয়, শুধু যে গানই রচনা করবেন - সুর দেবেন, তারই পূর্বাভাস আমরা যেন দেখি 'খেয়া' কাব্যের 'পঞ্চান্নটি কবিতার মধ্যে দশটিতে সুর যোজনা করার মধ্য দিয়ে। তাই তাঁর এই সমস্ত কাব্যগ্রন্থে আমরা দেখি কবিতাকে গানে রূপান্তরিত করার প্রয়োজনে তিনি কোথাও বাণীর বদল ঘটিয়েছেন, কোথাও পংক্তিরও বিন্যাস করেছেন, কোথাও বা আয়তনকে ছোট ও ঘনবিনন্ধ করেছেন। যেমন এ কাব্যের 'সীমা' কবিতাটি - 'সে টুকু তোর অনেক আছে' - গানে রূপান্তরিত হয়ে দাঁড়াল -

এক মনে তোর একতারাতে
একটি যে সুর সেইটি বাজা।

- একটি বিখ্যাত ব্রহ্মসংগীতে। কিন্তু গীতাখ্য কাব্যত্রয়ে এসে সব কবিতাই হল গান, আর সব গানই হল কবিতা।

এরপর এল 'গীতাঞ্জলির' গানের জোয়ার। কবির মন তখন গীতরসে পূর্ণ। 'গীতাঞ্জলিপর্ব' থেকে গান যেন তাঁর ভাবের প্রধান বাহন হয়ে দাঁড়াল।" রবীন্দ্রনাথ কৈশোর হইতেই গান লিখিতেছেন, কিন্তু হিসাব করিলে দেখা যাইবে গীতাঞ্জলিপর্ব হইতেই গান - কবিতা নহে - তাঁহার ভাবের বাহন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কি সংখ্যা-বাহুল্যে, কি কাব্যসৌন্দর্যে গীতাঞ্জলির উত্তরপর্বের গান তৎপূর্বের গানের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ।" [২৬]

'গীতাঞ্জলির' শুরু থেকে 'গীতালির' শেষ যেন এক অনবিচ্ছিন্ন সংগীত প্রবাহ। 'গীতাঞ্জলির' একশো সাতান্নটি কবিতার মধ্যে সুরায়িত সংগীতের সংখ্যা ছিয়াশিটি। এখানে শুধু আধ্যাত্মিকতার প্রকাশই নয়, প্রকৃতিও যেন গান ও কবিতার মধ্য দিয়ে উজ্জ্বলরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

গীতাঞ্জলী কাব্যের পর পরই 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালি' প্রকাশিত হল যথাক্রমে ১৩১৮ চৈত্র - ১৩২১ জৈষ্ঠ, ও ১৩২১ ভাদ্র-কার্তিক (ইংরাজীর ১৯১৪ সালে)। গীতিমাল্যের একশো এগারটি কবিতার মধ্যে গানের সংখ্যক উনন্বই, আর গীতালির একশো আট ও লেখক কর্তৃক বর্জন চিহ্নযুক্ত অসম্পূর্ণ এগারটি (১০৮ + ১১টি কবিতা) কবিতার মধ্যে সুরান্বিত গান পাওয়া যায় আটষট্টি ও পরে সংযোজিত পাঁচটি। এই সময়টা কবির সংগীত সৃষ্টির যুগ। তিনি যেন গানের সুরের মধ্যে অবগাহন করছেন।

'বলাকার' আবির্ভাব - ১৯১৬। এই সময় কবির কাব্যজীবনে ধীরে ধীরে একটা পরিবর্তন আসছে। এখানে এসে তাঁর ভগবৎ প্রীতি মানব প্রীতিতে রূপান্তরিত হল। গানের সংখ্যাও কমে আসতে লাগল। 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের পঁয়তাল্লিশটি কবিতার মধ্যে চারটিতে সুর যোজিত হয়েছিল।

১৯১৮ ও ১৯২২ সালে যথাক্রমে 'পলাতকা' ও 'শিশু ভোলানাথ' রচিত হয়। এ কাব্যগ্রন্থ দুটিতে কোন গান নেই।

তারপর 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থ রচনাকাল ১৯২৫। এর সাতাত্তরটি কবিতার মধ্যে মাত্র তিনটি কবিতা গানে রূপান্তরিত হয়েছিল। 'বলাকা' পর্ব থেকেই ক্রমশ সুরান্বিত গানের সংখ্যা সীমিত হয়ে কবিতা ও গান দুটি ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়।

'মহুয়া'র প্রকাশকাল ১৯২৯ - সাতষট্টিটি কবিতার মধ্যে সুরযোজিত গান নয়টি।

'বনবাণী' প্রকাশকাল ১৯৩১। ঘরের আশপাশের বোবা বন্ধু যারা আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে রয়েছে, সেই গাছগুলোর প্রতি ভালবাসাই কবির এ কাব্যগ্রন্থের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এখানে পনেরটি কবিতার মধ্যে গানের সংখ্যা ছটি। এ গানগুলি

বর্ষামঙ্গল, বৃক্ষবন্দনা - বৃক্ষরোপন প্রভৃতি নানা উপলক্ষে রচিত।

'পরিশেষ' (১৯৩২) - কবির গানের স্রোতধারা যে ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে তা এই সব কাব্যগ্রন্থের কবিতা ও গানের সংখ্যার দিকে তাকালেই দেখতে পাই। এখানে নিরানব্বইটি কবিতার মধ্যে সুরযোজিত গান হয়েছে মাত্র দুটি।

'পুনশ্চ' (১৯৩২) কাব্যগ্রন্থে গান নেই।

'বিচিত্রিতা' (১৯৩৩) কাব্যগ্রন্থের একত্রিশটি কবিতার মধ্যে মাত্র একটি গান।

'শেষ সপ্তক' (১৯৩৫) - কোন গান নেই। কবির গানের ধারা ক্রমশই কমে আসছে।

পরবর্তী 'বীথিকা' (১৯৩৫) - কাব্যগ্রন্থের সাতাশটি কবিতার মধ্যে গানের সংখ্যা পাঁচটি।

প্রায় চার বৎসর পরে রচিত হয় 'প্রহাসিনী' কাব্যগ্রন্থ (১৯৩৯)। বীথিকার পর 'পত্রপুট' (১৯৩৬), 'শ্যামলী' (১৯৩৬), 'খাপছাড়া' (১৯৩৭), 'ছড়ার ছবি' (১৯৩৭), 'প্রান্তিক' (১৯৩৮), 'সেঁজুতি' (১৯৩৮) - অর্থাৎ প্রহাসিনী পূর্ববর্তী এ কাব্যগ্রন্থগুলিতে আমরা কোন গান পাইনা। 'প্রহাসিনীর' বত্রিশটি কবিতার মধ্যে মাত্র একটিতে সুর যোজনা করে গানে রূপান্তর করা হয়েছে।

আবার 'সানাই' (১৯৪০) কাব্যগ্রন্থ রচনাকালে বার্ধক্যে কবিকে যেন নানান খেয়াল খুশিতে পেয়ে বসেছে, যেন তাঁর সংগীতের ঢল নেমেছে। শুধু তাই নয়, এখানে তিনি নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। কবিতাকে গানে রূপান্তরিত করেছেন, গানকে ভেঙে কবিতার সৃষ্টি করেছেন। কবির লেখনী স্পর্শে কবিতা হয়ে উঠেছে গান। এ কাব্য-গ্রন্থের একষট্টিটি কবিতার মধ্যে থেকে তেইশটি গান হিসাবে সুরান্বিত হয়েছে ও পরে গীতবিতানে স্থান করে নিয়েছে।

'রোগশয্যা' (১৯৪০) - এ সময় কবিতা রচিত হলেও জীর্ণ শরীর ও মন থেকে গানের সুর উৎসারিত হচ্ছে না। উনচল্লিশটি কবিতার মধ্যে কবি মাত্র একটিতে সুর যোজনা করেছেন।

'শেষ লেখা'-(১৯৪১) - পনেরটি রচনার মধ্যে তিনটি মাত্র গান আছে।

কাব্যজীবনের শুরু থেকেই কবি তাঁর কবিতায় বর্ণিত প্রকৃতি, মানবজীবন, বিশ্বজগৎ সর্বত্রই সব কিছুর মধ্যে সংগীতকে প্রত্যক্ষ করে এসেছেন এবং এই উপলব্ধি পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে গীতাঞ্জলিপর্বে এসে, যেখানে কবিতা ও গান অন্যোন্য হয়ে উঠেছে। হয়ে উঠেছে একে অন্যের সম্পূরক। সুতরাং তাঁর রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকে শুরু করে শেষ কাব্যগ্রন্থ পর্যন্ত সংগীতের ক্ষেত্রে যে ভাবের বিকাশ ও তার পরিণতির পরিচয় পাওয়া যায় রবীন্দ্রসংগীত সম্বলিত রবীন্দ্রকাব্যগুলির ক্ষেত্রে এটিই আলোচ্য বিষয়।।

: উল্লেখপঞ্জী :

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সংগীতচিন্তা - সংগীত ও কবিতা : বিশ্বভারতী : প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৭৩, ১৮৮৮ শক : পৃ.১৯

২. তদেব : আত্মকথা - ছিন্নপত্রাবলী : শিলাইদহ, ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫ : পৃ.১৯৮

৩. তদেব : আত্মকথা-জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলা : পৃ.১৮১ - ৮২

৪. রবীন্দ্ররচনাবলী (৭ম খণ্ড) : শান্তিনিকেতন 'শোনা' : বিশ্বভারতী : সুলভ সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৯৫, ১৯১০ শক। পৃ.৫৪৬

৫. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক (২য় খণ্ড) : বিশ্বভারতী : চতুর্থ সংস্করণ চৈত্র ১৩৮৩ : ১৮৯৯ শক : পৃ.২৫৩

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সংগীতচিন্তা - বিবিধ প্রসঙ্গ : পত্রে (২৯ অক্টোবর, ১৯৩৭, দিলীপ কুমার রায়কে লিখিত) : বিশ্বভারতী : প্রকাশ বৈশাখ ১৩৭৩ : ১৮৮৮ শক : পৃ.২৩৯।

৭. তদেব : সংগীত ও কবিতা : পৃ.২২

৮. তদেব : [illegible] ও সুর : পৃ.৬৯

৯. তদেব : গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ : পৃ.২৭

১০. তদেব : বিবিধ প্রসঙ্গ : পত্রে (খড়দহ। দেওয়ালি ১৩৩৯, ১৯৩২) : পৃ.২৪২

১১. তদেব : বিবিধ প্রসঙ্গ : সাহিত্যের তাৎপর্য, অগ্রহায়ণ ১৩১০ : পৃ.২২৪

১২. কানাই সামন্ত : রবীন্দ্র প্রতিভা - কবি শিল্পি সুরকার রবীন্দ্রনাথ : রবীন্দ্র শতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে প্রথম প্রকাশ : ২২ শ্রাবণ, ১৩৬৮ : Indian Association Publishing Company Pvt. Ltd. P.

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সংগীত চিন্তা - সংগীত ও ভাব : বিশ্বভারতী : পৃ.৪

১৪. বিশ্বভারতী পত্রিকা (দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা) : বিশ্বভারতী : ১৩৫১ : পৃ.৪০০

১৫. রবীন্দ্ররচনাবলী (১ম খন্ড) অচলিত সংগ্রহ ভূমিকা : বিশ্বভারতী।

১৬. রবীন্দ্র-রচনাবলী (১ম খন্ড) : সন্ধ্যাসংগীত - "অনুগ্রহ" ও "গান-সমাপন" কবিতা : বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৯৩, ১৯০৮ শক : পৃ.২৩ ও পৃ.৩৭

১৭. তদেব : প্রভাত সংগীত স্রোত : পৃ.৭৩

১৮. রবীন্দ্র-রচনাবলী : জীবনস্মৃতি - বর্ষা ও শরৎ : বিশ্বভারতী : সুলভ সং (নবম খন্ড) : পৃ.৫১২

১৯. প্রমথনাথ বিশী : রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ : মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স : নবম মুদ্রণ ১৩৮৮ : পৃ.৮

২০. রবীন্দ্র-রচনাবলী (২য় খন্ড) : বিশ্বভারতী : সুলভ সং : 'চিত্রা' - 'উর্বশী' : পৃ.১৭৮

২১. তদেব (৩য় খন্ড) : 'চৈতালি' - 'গীতহীন' : বিশ্বভারতী : সুলভ সংস্করণ : পৃ.১০

২২. তদেব (চতুর্থ খন্ড) : ক্ষণিকা - 'উদ্বোধন' : সুলভ সংস্করণ : পৃ.১৭১

২৩. তদেব (চতুর্থ খন্ড) : 'ক্ষণিকা' - 'শেষ' :: সুলভ সং : পৃ.২৪১

২৪. তদেব (চতুর্থ খন্ড) : 'নৈবেদ্য' - ১ নং কবিতা : সুলভ সং : পৃ.২৬৫

২৫. তদেব (চতুর্থ খন্ড) : নৈবেদ্য - ১০০ নং কবিতা : সুলভ সং : পৃ.৩১২

২৬. প্রমথনাথ বিশী : রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ : মিত্র ও ঘোষ পাবলিসার্স : নবম মুদ্রণ ১৩৮৮ : পৃ.২৩